Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

জয়া মিত্র'র ছোটোগল্পে ইতিহাস - লোকশ্রুতি ও ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনর্বিন্যাস

শ্রীমতী মজুমদার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/15_Srimati-Majumdar.pdf

সারসংক্ষেপ: অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ আমাদের চিরন্তন, তাই আমরা বারবার ফিরে যেতে চাই অতীত প্রাণপ্রবাহে; আর আমাদের সাবেকী অস্তিত্বকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চাই। প্রাচীন পুরাণ ইতিহাস অথবা শিল্প-সাহিত্যের ভাবনার নবমূল্যায়নের এই প্রবণতা উনিশ শতক থেকেই বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী লেখিকা শ্রীমতী জয়া মিত্র তাঁর একুশ শতকের সৃষ্টি 'অকাজের বউ' গল্প সংকলনটির 'মেঘদূত' ও 'কাছে যাওয়া' গল্প দুটিতে ধ্রুপদী সাহিত্য ও কিংবদন্তীকে সময়ের ভাবনায় সঞ্জীবিত করে সম্ভাব্য সত্যে পরিণত করেছেন এবং আধুনিক দৃষ্টিতে পুরাতন মিথগুলির পুনর্নির্মাণ করেছেন।

সূচক শব্দ: ধ্রুপদী ভাবনা, পুরাণের নবজন্ম, পুর্নমূল্যায়ন, প্রতিবাদী চেতনা, মঙ্গল চেতনা, একুশ শতক

একুশ শতকের প্রথম দু'দশক কেটে গেল। অতি সাম্প্রতিক বর্তমানে এক অস্থির ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের জীবন এগিয়ে চলছে — আর সে জীবনেও আছে অনিবার্য সংকটের সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার নিরন্তর প্রচেষ্টা। চলমান সৃষ্টিশীল জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে ও যাবতীয় প্রাপ্তিকে আত্তীকরণ করেই এগিয়ে চলছি আমরা। এটি লক্ষণীয়, আধুনিক বস্তুবিশ্বেকেও আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। ঐতিহ্যের অমোঘ আকর্ষণ, তাই বারবার ফিরে যেতে চাই অতীত প্রবাহে। অতীতের গর্ভে সুপ্ত থাকে আমাদের যে সাবেকী অস্তিত্ব তাকেই পুনরাবিষ্কার করতে চাই। আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ করি, আত্মপ্রতিষ্ঠার তৃপ্তি উপলব্ধি করি।

প্রতিটি শতকের সৃষ্টিতে মিশে থাকে যুগপোযোগী কল্পনা, বিশিষ্ট ভাবনা, শিক্ষা ও সমাজভাবনার স্বাতন্ত্র্য। এভাবেই আমরা উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত, মেধা — মননে সূচিত সৃষ্টি হতে দেখি প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাস অথবা শিল্প-সাহিত্য ভাবনার নবনির্মিত তথা পুনর্বিকশিত হবার প্রবণতাটি, এভাবেই সৃষ্টি হয় 'মেঘনাদবধ'এর মতো শাশ্বত সৃষ্টি এবং আরো অনেক। সেই ধারার প্রবহমানতা বিংশ শতকেও অক্ষুন্ন থেকেছে শুধু তাই নয়, বহুধা বিস্তৃত হয়েছে। একুশ শতকেও এ ধরণের সৃষ্টি বিরল নয়, উপরন্তু প্রায়শই তার প্রকাশ আমরা দেখি। বারবার আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, প্রাচীন-সাহিত্য-ইতিহাস-কিংবদন্তী। প্রবীণের মনোবীজে অঙ্কুরিত হয়, নবীন সমাজভাবনা ও মানবদর্শন, আর অবশ্যম্ভাবীরূপে তাতে যুক্ত হয় মুক্তদৃষ্টি, ভিন্নমুখী বিচারপ্রবণতা ও আধুনিক গবেষণার বহুসূত্র।

একুশ শতকে রচিত সাহিত্যেও আমরা বহু লেখক-লেখিকার কলমে এই শিল্প-সাহিত্যের ধ্রুপদী ধারা বা পৌরাণিক-ঐতিহাসিক কিংবদন্তীগুলিকে নতুন ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত অথবা সময়োচিত ভাবনায় সঞ্জীবিত হয়ে সম্ভাব্য সত্যে পরিণত হতে দেখেছি।

বিশ শতকের সেরকম এক সাহিত্যিক হলেন জয়া মিত্র। একুশ শতকে (২০১৫) লেখা তাঁর 'অকাজের বউ' গল্পসংকলনের দুটি গল্প আমি নির্বাচন করেছি, 'কাছে যাওয়া' ও 'মেঘদূত', সেখানে লেখিকার বর্তমানের ভাবনায় অতীতকে দেখার প্রবণতা ও ইচ্ছা স্পষ্ট। মূলত কবিতা দিয়ে তাঁর সৃষ্টিজীবন শুরু হলেও পরে তা ব্যাপ্ত হয় ভিন্ন ধর্মের রচনায়। সেখানে রয়েছে ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, বিভিন্ন প্রতিবেদন, রাজনৈতিক রচনা

ইত্যাদি সবই। এরই পাশাপাশি তিনি শিশু-কিশোরপাঠ্য সাহিত্যও রচনা করেছেন, যেমন — 'ভালো রাক্ষসের বই', 'রূপালী বেতের ঝাঁপি' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন একটি উপন্যাস 'বড় হবার দিন'। দীর্ঘকাল সম্পাদনা করে চলেছেন পরিবেশ ও সংস্কৃতি ভাবনা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ভূমধ্যসাগর'। সম্প্রতি তাঁর সৃষ্টি তালিকায় যুক্ত হয়েছে একটি স্মৃতিকথা জাতীয় রচনা 'যাত্রা শুরু' এবং সত্য ঘটনা ভিত্তিক একটি উপন্যাস 'স্বর্ণকুমারীর মৃত্যু ও জীবন' — সুস্থ জীবন প্রত্যাশী এক দলিত কন্যা ও তার পরিবারের সংগ্রামের গল্প। তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মের মূলে রয়েছে রাজনীতি-সচেতনতা, সমাজবোধ ও গভীর মানবিক দৃষ্টিকোণ। এই মানবিকতা নিছক নারীবাদ নয় — সামগ্রিকভাবে অপেক্ষাকৃত বলশালী প্রতিপক্ষের কাছে কেমনভাবে লাঞ্ছিত ও পীড়িত হতে হয় দুর্বল শ্রেণিকে তাই তাঁর বহু লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, স্বাভাবিকভাবেই পুরুষতান্ত্রিক এই বিশ্বে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণি বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা এবং প্রান্তিক শ্রেণির পুরুষদেরই বোঝানো হয়। তাছাড়া শুধু মানবসমাজ নয় আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও জীবজগৎ তথা পরিবেশ রক্ষায়'ও তিনি এক অতন্দ্র প্রহরী — এই অনুভব তাঁকে অনন্য করেছে।

২

'এরি ম্যয় তো প্রেম দিওয়ানী / মেরো দর্দ না জানে কোই
ঘায়েল কি গতি ঘায়েল জানে / যো কোই ঘায়েল হোয়'

'কাছে যাওয়া' গল্পটির পটভূমিকায় হিমালয়ের মনোরম প্রকৃতি, অদ্ভুত এক স্নিগ্ধ ভোরের বর্ণনার ভেতর দিয়ে আমরা গল্পটিতে প্রবেশ করি।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, ভোর হচ্ছে, তখনো সূর্যের প্রথম আলো ভালো করে পৃথিবী স্পর্শ করেনি। শুধু ঘন জমাট অন্ধকারকে কিছুটা হালকা করেছে। ভুজ গাছের ডালে বসে থাকা অনামা পাখির শিসে ঘুম ভেঙ্গো যায় কৃষ্ণপ্রাণার, ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করেন। শুরু হয় কৃষ্ণপ্রাণার আর একটি দিন — পাহাড়ী নদীর বরফ গলা জলে প্রাত্যহিক কর্ম সেরে ঘরে ফিরে — "গুহার ভেতর তাঁর শ্যামলালার সামনে আসনটি পেতে বসেন, শ্যামের জাগরণ দিতে, 'জাগো বংশীবালে — রজন বীতি ভোর ভয়ো জি ঘর ঘর খুলি কিকড়ে... '। আর এই সুপরিচিত মীরার ভজনের গভীর প্রভাতী সুরমূর্ছনার রেশ নিয়ে আমরা ঢুকে পড়ি কাহিনির আর একটি স্তরে। যোড়শ শতকের ভারতবর্ষব্যাপী ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধি মীরাবাঈ আমাদের অতিপরিচিত নাম। কথিত আছে আনুমানিক ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম বেনারসে, মতান্তরে রাজস্থানের পালি জেলায়, 'বুরকি' নামে কোনো এক গ্রামে। পরে তিনি হন চিতোরের রাজবধূ। মীরার বাবা ছিলেন এক নিষ্ঠাবান শৈব — ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গো শিবের স্তোত্র-ভজন গাওয়া, গঙ্গায় স্নান করা ছোটো মেয়েটি বৃন্দাবনের পরম বৈষ্ণব গোবিন্দদাসের সান্নিধ্যে আসে। তাঁর দিয়ে যাওয়া কালো পাথরের এক অপূর্ব কৃষ্ণ মূর্তি পেয়ে, কেমন অলৌকিকভাবে মীরা দিনে দিনে কৃষ্ণনিবেদিত প্রাণ সাধিকা হয়ে উঠলেন, এ সব কাহিনি ছড়িয়ে আছে লোকশ্রুতিতে। 'কালো পাথরের মুখে রূপোর পাতের চোখ, হাতে বাঁশি, মাথায় শিখিপাখা, পীতাম্বর, অপূর্ব এক কৃষ্ণ মূর্তি মীরাকে দিয়ে গেলেন গোবিন্দদাস এবং সেই মূর্তি মীরার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল।' ওই যেন হয়ে উঠল তার গানের উৎস... মীরার বুকের ভিতর থেকে আপনি শব্দ উঠে আসে সুর নিয়ে আসে — 'পেয়ারে দর্শন দিজো আয়ে / তুম বিন রহয়ো না যায়ে... ' গল্প শুরু হয়েছিল যাঁকে দিয়ে, সেই কৃষ্ণপ্রাণা মীরাবাঈয়ের মতোই এক কৃষ্ণভক্ত-সাধিকা, যিনি হিমালয়ের কোনো পার্বত্য গুহায় নির্জনে একাকী বাস করেন। দিন কাটে তাঁর কৃষ্ণের ভজনায়; মীরার গান গেয়েই তিনি তাঁর শ্যামলালের আরাধনা করেন। তাঁর গানের প্রসঙ্গোই গল্পে আসে মীরার অলৌকিক জীবন ও কৃষ্ণপ্রেমের কাহিনি। কৃষ্ণপ্রাণার স্মৃতিপথ বেয়েই মীরাবাঈ এসে ধরা দেন পাঠকের চেতনায়। একবার মীরাবাঈ ও তাঁর রাজপরিবারে বধূজীবন — কেমন করে তিনি তাঁর প্রেমিক স্বামী কৃষ্ণ কানহাইয়াকে বুকে করে অগ্রাহ্য করেন প্রবল রাজশক্তিকে, অটল-অচল সুস্থিত থাকেন নিজের প্রেমে সেই কাহিনি; আবার তারই পাশাপাশি কৃষ্ণপ্রাণার বর্তমান জীবন, শ্যাম আরাধনায় নিবেদিত জীবনের গল্পও বলে চলেন লেখিকা। প্রাতঃকালীন কৃষ্ণআরাধনা হয়ে গেলে, স্নান সেরে তিনি গিয়ে বসেন ভাগীরথীর তীরে, গঙ্গার পাড়ে বসে দীর্ঘ

সময় জুড়ে গঙ্গাস্তোত্র জপ করেন। গঙ্গার এই কৃচ্ছ্রসাধনা, দীর্ঘপথ চলার অধ্যবসায়, তার মাহাত্ম্যের কথা ভাবতে থাকেন মনে, মনে। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায়, একসময়ে যমুনা নদীকে চোখে দেখার জন্য কী অদম্য ব্যাকুলতা ছিল তাঁর? ওই যমুনার তীরেই তো তাঁর মনের মানুষের অবাধ বিচরণ — যাবতীয় লীলা! কৃষ্ণের জীবনের সবকটি-পর্বের কথা ভাবতে ভাবতে বয়সের ভারে সুরহীন গলায় গান গুনগুনিয়ে ওঠে — 'এই গানই তো তাঁর ধ্যান-পূজা, অর্চনা সব। গান না গেয়ে কী করে ঘুম থেকে তুলবেন শ্যামসুন্দরকে, সমস্ত জগতের অধীশ্বর হয়েও যিনি সব ভক্তের কাছে তার নিজের, তার একান্ত আপন গিরিধারী। যিনি গানের সুরে এই নির্জন পর্বতগুহার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন, গান শুনে ঘুম থেকে জাগেন'। আবারও ফিরে আসে মীরাবাঈয়ের কথা, নিষ্প্রাণ পাথরের দেয়াল ঘেরা রাজপ্রাসাদের অন্দর-মহলে বসে, এই কথা এই সুরই তো — "মেয়েটির হৃদস্পন্দনকে ফুটিয়ে তুলত ভালবাসার আলোর দিকে।" সেই আলোতেই তো প্রতি মুহূর্তে তিনি দেখতে পেতেন তাঁর শুধু তাঁর 'গিরিধারী গোপালকে' — 'মোর মুকুট পীতাম্বর শোভে / গলে বৈজয়ন্তী মালা / বৃন্দাবন মে ধেনু চরায়ে / মোহন মুরলী বালা' — আর এই ভালোবাসার পবিত্রতা — গভীরতা নিবেদনের সর্বস্বতায় মুগ্ধ হয়ে স্বামী শম্ভা সিংহের মন থেকে দূর হয়ে যায় সব অভিমান-ক্ষোভ। উপলব্ধি করেন তিনি — 'মীরা আমাদের মত নয় — ওর মধ্যে দেবতার বাস। সেই দেবতাই ওকে গান গাওয়ান। দেবতার গানকে কবে কোন রাজমহল আটকে রাখতে পেরেছে! দেবতার তো ঘর-বাহির নেই'। রাজ-অবরোধের নিয়ম ভাঙ্গা, কুলাচার অগ্রাহ্য করা বিদ্রোহিনী পুত্রবধূটির ওপর বিরূপ রাজমাতাও একসময় ক্রমে ক্রমে বোঝেন, এ মেয়ে সকলের চেয়ে আলাদা। একে সবার মাপকাঠিতে বিচার করা যাবে না। তাই তো শম্ভা সিংহের মৃত্যুর পর যখন মীরা মহলে থাকা একেবারেই ছেড়ে দিল, প্রাসাদের বাইরে তাঁর মন্দিরেই সময় কাটাতে লাগল, নতুন রাজা ক্রুদ্ধ হলেন রাজবধূর বেচাল দেখে, তখন মহারানী তাকে বোঝাবার চেষ্টাও করেছিলেন — 'ও সত্যি সত্যি সন্ত হয়ে গেছে, সন্ন্যাসিনী। মহলে এসে ঘুমোয় এই পর্যন্ত। লোকেও ওকে সন্ত বলেই ভাবে। রাজমহলের কথা ভাবে না আর।' আর তাই দেবরের কোপে পড়া বন্দিনী মীরাকে সবার অলক্ষ্যে গভীর নিশীথে রাজপ্রাসাদ থেকে চিরতরে মুক্তি দেন। তারপর যোগিনী হয়ে মীরা চলে যান যমুনার তীরে তাঁর প্রেমাস্পদের খোঁজে। লোকশ্রুতি বলে সেখানেই (মতান্তরে দ্বারকা) কৃষ্ণমন্দিরে তিনি কৃষ্ণবিগ্রহে বিলীন হয়ে যান। আর কেউ তাঁর দেখা পায় না। মীরার অঙ্গের বস্ত্রখানি জড়িয়ে ছিল তাঁর প্রিয়তম নন্দলালার শরীরে। কথিত আছে ১৫৪৬ সালে তাঁর মৃত্যু। আর সে মৃত্যুকাহিনিও রহস্যের জালে আচ্ছন্ন। রানার প্রেরিত গুপ্তঘাতকের হাতেই তাঁর মৃত্যু নাকি অলৌকিক প্রয়াণ সে সব প্রশ্ন আজ অর্থহীন। কালে কালে সে সব কাহিনি মিথে পরিণত।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়ে, ভাগীরথীর তীর থেকে গুহায় ফেরেন কৃষ্ণপ্রাণা। এইবার গুহায় বসেই তাঁর পূজার্চনা শুরু হয়। এবড়ো-খেবড়ো, অসম্পূর্ণ নানা রঙের পাথরে গড়া গুহাটি। 'নানা রং কোথাও ধূসর, কোথাও হলুদ, সাদা বা গোলাপি। চেয়ে থাকতে থাকতে কত যে রূপ ধরা দেয় চোখে'। আর এই নানা রং এর মধ্যেই কৃষ্ণপ্রাণা যেন খুঁজে পান তাঁর ঈশ্বরের নানা রূপ। গুহার মধ্যে একটি জায়গায় খানিক মেঘ রং এর পাথর, কল্পনায় তারই কপালে এক তিলক আঁকেন কৃষ্ণপ্রাণা। আর সেদিকে অপলকে দেখতে দেখতে তাঁর চোখে মূর্ত হয়ে ওঠেন 'মোহন মুরলিওয়ালা' — তাঁর কালো চোখের দৃষ্টি, চাঁচর কেশ আর প্রেমমাখা মৃদু হাসি — 'হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার / লহু লহু হাসে পঁহু পিরীতির সার'। প্রিয়তমকে দেখার কামনায় আকুল হয়ে গেয়ে ওঠেন — 'তুম বিন রহিয়ো না যায়, প্যারে দরসন দিজো আয়ে' — সেই কালো রূপের ছটা দেখতে দেখতে কৃষ্ণপ্রাণা হারিয়ে যান অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে! কীভাবে, কবে, কতদিন ধরে হেঁটে তবে তিনি পৌঁছেছিলেন এখানে? অন্তরের কোন অদম্য কামনা তাঁকে চালিত করেছিল? কাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন! কোথা থেকে কেটে গেছে, পার হয়ে গেছে মাস, বছর, কিছুই অনুভব করেননি। এ যেন সেই চিরদুখিনী রাইকিশোরীর অনুভবই ধরা দেয় পাঠকের মনে — 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর / পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর' — তারপর এক মহাপ্রলয়ের রাতে, প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় নেয়া চীরগাছের ডালটিও যখন ভেঙ্গে পড়ল পিঠের ওপর, তখন সেই প্রলয় অন্ধকারের মধ্যেই কী মিলন হলো মনের মানুষের

সঙ্গো! রবীন্দ্রনাথের গানে এই পরাণসখার সঙ্গোও তো মিলন হয় এমন বিপর্যয়ের মাঝে — 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণসখা বন্ধু হে আমার'— এখনো কৃষ্ণপ্রাণার সংশয় ঘোচেনি! নাকি সেই প্রাণরক্ষাকারী বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর মধ্যেই ছিলেন তাঁর চিরসখা? তারপর তাঁর শুরু হলো এক নতুন জীবন — শিক্ষাগ্রহণ-শাস্ত্রপাঠ-দীক্ষালাভ-নতুন নামকরণ, সব কিছুর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন। সেই উপলব্ধির মাঝেই ধরা দিলেন তাঁর একান্ত প্রেমিক পুরুষ, সৃষ্টির অনু-পরমাণুতে যাঁর পরশ পাওয়া যায়।

গুহা অভ্যন্তরে সেই 'মেঘ রঙা পাথরটির দিকে চেয়ে থাকেন কৃষ্ণপ্রাণা' — যেন রাই কিশোরীর মতোই আত্মবিস্মৃত হয়ে যান — 'সদাই ধেয়ানে / চাহে মেঘপানে / না চলে নয়নতারা' — দেখতে দেখতে সেই রং আচ্ছন্ন করে তাঁর চেতনা — অপার্থিব আনন্দে ভরে ওঠে মন — 'পুলকে আকুল দিক নেহারিতে / সব শ্যামময় দেখি' — কৃষ্ণপ্রাণার নিখিল ভুবন জুড়ে তখন শুধুই শ্যাম বিরাজমান — 'গুহার সব পাথর শ্যামবর্ণ হয়ে ওঠে গুহার বাইরে পাহাড় থেকে পাহাড় পর্বতরাজি আকাশ তার ছায়া বুকে নিয়ে গঙ্গাজল গভীর কোমল শ্যামবর্ণ হয়, সহস্র হাতে সে শ্যাম কৃষ্ণপ্রাণাকে স্পর্শ করেন। বনমালার সুগন্ধ ওঠে' — একান্ত সেই শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণপ্রাণার সব চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ করেন।

সাধিকার হৃদয় অভ্যন্তরে যে, 'নিত্য বৃন্দাবন' সেখানেই চলতে থাকে নিত্য মিলনের লীলা। 'মানুষের জীবনে এক সময় হয়তো চোখের দেখা বড়ো গভীর পিপাসা আনে। চোখে দেখার ইচ্ছা, চোখে দেখার আকাঙ্খা' — কিন্তু যখন অন্তরের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন পার্থিব জগতের সব চাওয়া-পাওয়া তুচ্ছ হয়ে যায়। এক অদ্ভুত শান্তিতে-পবিত্রতায় গল্পটি শেষ হয়। মনে পড়ে যায় আর এক কৃষ্ণভক্ত শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কিত কিংবদন্তীটির কথা — ভরা বর্ষায় পুরীর সমুদ্রের বিশাল ব্যাপ্ত কৃষ্ণরূপ প্রত্যক্ষ করে কৃষ্ণজ্ঞানে সমুদ্র বক্ষে লীন হয়ে যান মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য — যুক্তি-বুদ্ধির থেকে অনেক দূরে পরমবিশ্বাসের জগতে আমাদের সংশয়ী মন আশ্রয় পেতে চায়।

৩

গল্পটিতে আগাগোড়া এক অস্পষ্টতা, রহস্যময়তার ইঙ্গিত — 'না বলা বাণীর' আনাগোনা। বাক্‌পথের অতীত সেই অনুভব আমাদের আচ্ছন্ন করে। লেখিকা কৃষ্ণপ্রাণার পূর্বপরিচয় কিছু দেননি, মীরার সঙ্গো তাঁর আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কী? মাঝে মাঝে মনে হয়, একই ব্যক্তিস্বরূপের জন্মান্তরের কাহিনি! গল্পে কৃষ্ণপ্রাণার সময়ের কোনো উল্লেখ নেই। ইচ্ছে করেই এক অস্বচ্ছতার আবরণে গল্পটিকে ঢেকে রেখেছেন লেখিকা। মীরা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, পরে ক্রমশ তাঁর জীবন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে গেছে। কাহিনির মীরার অংশটির উপকরণ লেখিকা সংগ্রহ করেছেন লোকশ্রুতির উৎস থেকে — মাঝে মাঝে মনে হয় মীরা ও কৃষ্ণপ্রাণা অভিন্ন সত্তা, রণছোড়জীর মন্দিরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মীরাই ভবিষ্যতে কৃষ্ণপ্রাণা — সেই ইঙ্গিতই লেখিকা করেছেন। পাশাপাশি সমান্তরাল দুটি কাহিনি বয়ে চলেছে দুটি পাহাড়ী নদীর মতো, তারপর পৌঁছে গেছে একই প্রেমের আশ্রয়ে। লেখিকা আধুনিক মননে প্রচলিত কিংবদন্তীর পুনর্নির্মাণ করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে জয়া মিত্র'র অন্যান্য গল্পের ধারা থেকে এটি বেশ আলাদা, বিষয় ও বলার ভঙ্গি দু-ই অভিনব। অলৌকিক-কিংবদন্তী-জনশ্রুতির প্রতি আমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ, তার সঙ্গো মিশে গেছে পার্বত্য অঞ্চলের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, যা সমতলের মানুষকে সহজেই মুগ্ধ করে। কিন্তু একথাও কখনো ভুলতে পারিনা, ঈশ্বরে নিবেদিত প্রাণ মীরাবাঈয়ের ভগবৎ প্রেমের কাহিনিতেও মিশে আছে, মধ্যযুগের ভারতের রক্ষণশীল রাজতন্ত্র ও সমাজ পরিবারের প্রথাকে অগ্রাহ্য করার প্রতিবাদের কাহিনি — এক নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এটিই লেখিকার স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান।

শ্রীমতী জয়া মিত্রের দ্বিতীয় গল্পটি হলো 'মেঘদূত', এটিও তাঁর 'অকাজের বউ' ছোটোগল্প সংকলনের

অন্তর্ভুক্ত। কালিদাসের এই বিশ্ববিশ্রুত অমর দূতকাব্য 'মেঘদূত' যুগাতিশয়ী কাল ধরে সৃষ্টিশীল মানব চেতনায় রসের জোয়ার এনেছে। এই কাব্য, শিল্পের ভিন্নমুখী শাখায় বারে বারে মৌলিক সৃজনের উৎসমুখ অবারিত করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এ কাব্য যে মূল 'ভাবনাবীজ'কে পল্লবিত করে তুলেছে, তাতে দৃশ্যময়তার ভাব অধিক থাকার ফলে, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য অর্থাৎ 'দৃশ্য শিল্পে' (Visual Art) এর নান্দনিকতা গভীর প্রভাব ফেলেছে। আমাদের চিত্রকলার ইতিহাসের দিকে সামান্য দৃষ্টি দিলে, বিশ শতকের শুরুতে Bengal School of Art বা নব্যবঙ্গীয় চিত্ররীতির জনক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূত' ছবিটি আমাদের মন আকর্ষণ করে। এছাড়া নব্যবঙ্গীয় চিত্ররীতির আর এক বিখ্যাত শিল্পী শৈলেন্দ্রনাথ দে (১৮৯১-১৯৭৫), তাঁর 'মেঘদূত' বলে একটি ছবি রয়েছে, সেটি এখন এলাহাবাদ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। গুরুশিষ্য পরম্পরায় এই ধারা অব্যাহত রয়ে গেছে। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র রাজস্থানের রামগোপাল বিজয়বর্গীয় (জন্ম ১৯০৫) দীর্ঘ তিনটি সিরিজ ধরে বহু দৃষ্টিনন্দন ছবির জন্ম দিয়েছেন যার বিষয়বস্তু মেঘদূত। একুশ শতকেও একাধিক শিল্প এখনো 'মেঘদূত' থেকে তাঁদের নতুন সৃষ্টির প্রেরণা পাচ্ছেন তার প্রমাণ মিলেছে। বর্তমানে মুম্বই নিবাসী কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় বা অলকা ত্রিবেদী (উজ্জয়িনী ১৯৭৫) এঁরা কেউ বা আধুনিক অথবা ঐতিহ্যনুসারী ছবি এঁকেছেন।

শান্তিনিকেতনবাসী প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজ-এর যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তি আমরা অনেকেই দেখেছি। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই প্রাচীন ভাস্কর্যে বহু যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তি পাওয়া গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি অতুলনীয় মেঘদূতের অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট বলে অনুমান করা যায়। আর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাকালে উনিশ শতকের সদ্য বিকাশোন্মুখ কাল থেকে আজ পর্যন্ত অজস্র কবি-সাহিত্যিক — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজশেখর বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ দেব, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেক নবীন প্রতিভাও 'মেঘদূত' কাব্যের মোহমায়ায় মুগ্ধ হয়েছেন। বিশেষভাবে মনে পড়ে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের অন্যতম কবি জয়দেব বসুর 'মেঘদূত' নামক দীর্ঘ কবিতাটির কথা। প্রাচীন কবির উদ্দেশ্যে নবীন কবির অতুলনীয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন! কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য শাখা, প্রবন্ধ, ছোটোগল্প, বা গানের ক্ষেত্রেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষণীয়। উনিশ ও বিশ শতকের প্রারম্ভিক পর্বে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায় (কল্পনা, লিপিকা, ক্ষণিকা, চৈতালী, মানসী) ও গদ্যরচনায় (প্রাচীন সাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে) তাঁর 'মুগ্ধতার' প্রতুল প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গো শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'ত্রয়ী', বইটি ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' খুবই পরিচিত আমাদের কাছে। এইভাবেই ধ্রুপদী ভাবনার পুনর্বিন্যাসের তালিকাটি ক্রমে দীর্ঘ হতে থাকে এবং আমরা পৌঁছে যাই একুশ শতকের এক রচনায় — লেখিকা জয়া মিত্রের 'মেঘদূত' গল্পে। সংক্ষেপে আমরা কাহিনিবিন্যাসটি একটু দেখে নিই।

২

'এমনসময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্বদিগন্তে এসে উপস্থিত উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে পড়ে গেলো মনে হল প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।'

এ কাহিনিও এক যক্ষের প্রবাসজীবনের কাহিনি — শ্রীমান যক্ষ তাঁর ফার্মের মালিক শ্রী কুবের মেহতা'র এক নবতম শিল্পদ্যোগে যুক্ত থাকার সুবাদেই এখন রামগিরি পর্বতে প্রবাসজীবন যাপন করেন। স্বজনহীন এই জীবনে স্থানীয় কিছু নারী-পুরুষ তাঁর সময়যাপনের একমাত্র সঙ্গী। সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে তিনি 'রোহিনীয়া' নামে এক প্রবীনা ও 'ললতিয়া' নামে তার এক যুবতী পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানে দিন কাটাচ্ছেন। আপাত কর্মহীন যক্ষের অলস প্রহর গণনা প্রায়শই শাশুড়ি-বধূর নিত্য কলহপীড়িত জীবন ছন্দে আন্দোলিত হয়। কখনো অবসাদ-বিরক্তি অথবা তাদের আন্তরিক আতিথেয়তায় দ্রবীভূত হয় তাঁর মন। এভাবেই যক্ষ কাটিয়ে দেন দীর্ঘ পাঁচ মাস। আপাতত তিনি এ স্থানটির শিল্প-নগরী স্থাপনের উপযোগিতা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং প্রভুর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। অবসরের প্রাচুর্যে নিবিড় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে যক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে এই পার্বত্য প্রদেশের রুক্ষতা, বর্ণহীনতা। তাঁর সাম্প্রতিক বাসভবনটির চারপাশেও

গাঙ্গোয় উপত্যকা সুলভ আর্দ্র শ্যামলিমার একান্ত অভাব। অঞ্চলে ইতস্তত বিন্যস্ত কয়েকটি মাত্র মহুয়া ও কুসুমবৃক্ষ ছায়াহীন উষ্ম প্রান্তরে একমাত্র আশ্রয়। স্বভাবতই বহু দূরবর্তী শিলংপ্রদেশের শীতল আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক শোভার স্মৃতি তাঁকে কাতর করে তোলে। তাপে অনভ্যস্ততাহেতু তিনি পূর্বের তুলনায় কিছুটা কৃশ হয়ে পড়েছেন। লক্ষণীয় ইদানীং তাঁর হাতঘড়িটিও যেন ঈষৎ শিথিল অনুভূত হয়। মাঝে মাঝে রোহিনীয়া-ললতিয়ার প্রস্তুত করা আয়াসসাধ্য খাদ্য-পানীয়ও তাঁর বিস্বাদ মনে হয়। এই শ্লথ গতিতে দিনযাপনের মধ্যে যক্ষ গভীর অভিনিবেশে লক্ষ করেন স্থানীয় মানুষের জীবনপ্রবাহের ধরণটি। সভ্য নাগরিক সমাজের বাইরে এ যেন এক অন্য জগৎ। এখানকার রমণীকুল বিশেষ পরিশ্রমী, ওদের দিন শুরু হয় বহু দূরবর্তী প্রাকৃতিক জলের ক্ষীণ উৎস থেকে জল আনা দিয়ে, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে 'কুণ্ডী'। (শব্দটি অনিবার্যভাবে আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'লবটুলিয়া বইহার'এর উত্তর সীমানাবর্তী 'সরস্বতী কুণ্ডী'র কথা) তারপর আরো নানাবিধ গার্হস্থ্য কর্মে কেটে যায় দিনের অবশিষ্ট সময়। এখানে পুরুষ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন বৃদ্ধ গিরিধারী সিং অথবা তাঁরই মতো দু'একজন সমবয়স্ক মানুষ। কোনো অজ্ঞাত কারণে অবশিষ্ট কর্মক্ষম পুরুষ সমাজ এখনো তাঁর গোচরে আসেনি। প্রায় প্রতিদিন মধ্যাহ্ন যখন ধীরে নিঃশব্দে অপরাহ্নের দিকে এগিয়ে যায় — সূর্যের তাপ কমে আসে, গোধূলির উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে সন্ধ্যার ছায়া ঘনায়, ঠিক তখনই নিম্নবর্তী টিলা থেকে বিরাট 'পাগড়ি' মাথায় উঠে আসেন গিরিধারী সিং — যক্ষের সারাদিন ব্যাপী গতানুগতিকতায় সামান্য বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগে।

গিরিধারী সিং-এর সঙ্গো সান্ধ্য আলাপে একে একে যক্ষ জেনে নেন তাঁর কর্মোপযোগী তথ্যগুলি — সাম্বৎসরিক ঋতুচক্র থেকে, স্থানিক-সংস্কৃতি, অথবা পরিবহনের ব্যবস্থা সবই আলোচনায় স্থান পায়। পার্বত্যপুরুষ সমাজের জীবন-অতিবাহনের প্রথা ও রীতিনীতিগুলি অবগত হয়ে তাঁর নাগরিক পরিশীলিত মনন বেশ আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এদিকে সময় নিজের ছন্দে এগিয়ে চলে;

'পিঙ্গাল বিহ্বল ব্যথিত নভোতল কই গো কই মেঘ উদয় হও / সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ও ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও'

ক্রমে অসহ নিদাঘের গতানুগতিক মন্থর দিনগুলি অবসন্ন পদক্ষেপে পার হয়ে যায়। এসে পড়ে আষাঢ়, উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয় — 'শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে / আয়লো কে ঝুলিবি আয় / প্রেম গীতছন্দে দুলিবি আনন্দে / ভুলিবি ভয়ভাবনায়...।

তাপিত বসুন্ধরার প্রাণ শীতল হবার সময় ঘনিয়ে আসে, মানুষগুলির মনেও আনন্দের ঢেউ ওঠে, প্রাত্যহিকতায় লাগে উৎসবের রং। বৃদ্ধা থেকে কিশোরী সকলেই যেন প্রকৃতির সঙ্গো স্নান সমাপন করে শুদ্ধ প্রসাধিত হয়ে ওঠে — তাদের মলিন গার্হস্থেও শ্রী ও সৌন্দর্যের ছোঁয়া লাগে। আঙিনার বৃক্ষশাখায় 'ঝুলা' বেঁধে শুরু হয় 'তীজ এর তেওহার' — নাচ আর গান — 'সখি বাঁধলো বাঁধলো ঝুলনিয়া / নামিলো মেঘলা মোর বাদারিয়া'

প্রবাসী পুরুষদের ঘরে ফেরার দিন নিকটে আসে। গিরিধারী সিং জানিয়ে দেন আষাঢ়ী পূর্ণিমা অতিক্রান্ত, আর বিলম্ব নেই, বৃষ্টি আসন্ন; ধীরে শ্রাবণ গগনে ঘোর ঘনঘটা ঘনিয়ে আসে, বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণে তপ্ত মৃত্তিকা তৃপ্ত হয়। প্রোষিতভর্তৃকা রমণীকুলের প্রিয় মিলনে উৎসুক উজ্জ্বল মুখগুলি যক্ষের মন ভারাতুর করে তোলে। এক দুর্বোধ্য বেদনা, অজানা অপ্রাপ্তিতে মন অস্থির হয়ে ওঠে — তবে কী প্রকৃতই 'আষাঢ় মাসে বিষাদের গুঁড়োঁ ভাসে'... দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা ঘোরে অবিন্যস্ত স্বপ্নেরা 'আধেক ঘুমে' আসা-যাওয়া করে, যক্ষ দেখেন — 'চম্পক পুষ্পে শোভিত দুইটি তরু, তাদের পাশ দিয়ে তৃণাবৃত একটি পথ... সেই পথে কোথায় যেন যাইবার ছিল, যাওয়া হইল না' — বিস্মৃতির অস্পষ্টতা থেকে কী যেন জেগে উঠতে চায় — 'মন খারাপের পাগল আষাঢ় মাসে / মেঘ হয়ে জমে আকাশের ক্যানভাসে'।

বহু যুগের ওপারে কবে কোন বিস্মৃত দিবসে প্রাচীন কবির চেতনায় ধ্বনিত হয়েছিল, 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপন্যথাবৃত্তি চেতঃ / কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনীজনে কিং পুনর্দূরসংস্থেন। যক্ষের মন উদাস হয়। অচিরে

অপরাহ্ন ঘনিয়ে আসে, শ্রী যক্ষ আলস্য পরিত্যাগ করে পশ্চিমের জানালা উন্মুক্ত করে দেন আর অকস্মাৎ — ‘যে মেঘ দেখে জাগে হৃদয়ে মনোহর মোহন কামনার উৎস / যক্ষ কোনমতে চোখের জল চাপে সে — মেঘ দেখে তার সমুখে’

দীর্ঘদিনের আতপ্ত শিলাময় রুক্ষ প্রান্তরে সহসা কে যেন অনুরাগের ছোপ দিয়েছে। ‘বাদলের ছায়া’ পড়েছে বিপুল প্রান্তরে — অবশেষে কী যক্ষের আবেদন সফল হলো — ‘সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! / দাও হে কজ্জ্বল পাড়াও ঘুম, বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও অঙ্গো হর্ষের পড়ুক ধূম।’ স্তরে স্তরে মেঘ নেমেছে দিগন্ত জুড়ে সজল বাতাসে স্নিগ্ধ হয়ে উঠছে ধরা — যক্ষের হৃদয়ে আকুতি ধ্বনিত হয় — ‘এগোও এগোও মেঘ শুধু এ চূড়া নয়, / সারাটা দেশ জুড়ে বালুকাতাপ’

শাল মহুয়ার আলোড়িত শাখা আর ঝলকিত বিদ্যুতে গগন চমকিত — ‘আকাশের পূর্বদিক হইতে শ্যাম গাভীদলের ন্যায় মেঘ বহিয়া আসিতেছে।’ সিক্ত মৃত্তিকার গন্ধে বিরহ কাতর যক্ষ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আঙিনায় তরুণীদল নৃত্যরত — নাই বা থাকলো তাদের পরণে মেঘ রংশাড়ি, আর ধানী রঙ চুনারিয়া! তাদের বেণীর মদির ছন্দে মনে ধরা দেয় এক বিস্মৃত বনিতার মুখচ্ছবি — ‘তুমি কি কখনো মেঘ শুনেছ তার / কথা, জন্মাবধি যার বিরহ রাত’? আকাশে ‘মেঘের ঘণিমা’, কামনামদির যৌবনের উচ্ছ্বাস, ওই সঙ্গীতের হিল্লোল, নবীন মেঘের উদবোধন বিরহী যক্ষকে উন্মনা করে তোলে — ‘চেতন-অচেতনে দ্বৈত অবলোপ, তা-ই তো কামুকের স্বাভাবিক’ (৫নং শ্লোক) যক্ষ ‘মেঘের দিকে আকুল হাত তুলিলেন’ — ‘সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়া / সন্দেশং মে হর ধনপতি ক্রোধ বিশ্লেষিতস্য’...। ‘প্রিয়ার বাহু থেকে কঠিন বিচ্ছেদ কুপিত ধনপতি / ঘটালেন আমার সমাচার পয়োদ নিয়ে যাও, / তুমি যে তাপিতের আশ্রয়’। একালের লেখিকার ভাবনায় পুনর্বিন্যস্ত ধ্রুপদী কাব্যভাবনায় রচিত হলো ‘অভিনব মেঘদুত’।

৩

আলোচ্য গল্পটিতে শ্রীমতী জয়া মিত্র অত্যন্ত সহজতায় কালিদাসের ‘মেঘদূতে’র কাব্যভাবনাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে, কাহিনির মধ্যে মধ্যে আপন ভাবনাকে সঞ্চারিত করেছেন। কাহিনিটির রচনাকাল যেহেতু একুশ শতক তাই সেই সময়োপযোগী পরিবর্তনের ছোঁয়ায় এটি বাস্তব জগৎকে স্পর্শ করেছে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার প্রতিভায় পুরাণ — ইতিহাস বা ধ্রুপদী সাহিত্যের নবমূল্যায়ন নানাভাবে হতে দেখেছি। কেউ বা মূল সাহিত্যের সময়কাল অপরিবর্তনীয় রেখে বিষয়ভাবনা ও চরিত্রচিত্রণে এনেছেন স্বাতন্ত্র যার চিরউজ্জ্বল নিদর্শন মাইকেলের ‘মেঘনাদবধকাব্য’। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের যুক্তি বোধ ও মুক্ত দৃষ্টির উজ্জ্বল আলোয় তা হয়ে উঠেছে যুগোত্তীর্ণ! অথবা রবীন্দ্রনাথ — সাবেকী চরিত্রভাবনায় ব্যাপক বদল এনেছেন যুক্তি ও আবেগের সমন্বয়ে নিজস্ব ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’এর কর্ণ চরিত্রের ক্ষেত্রে যা আমরা দেখেছি। কারো রচনায় বা ধরা দিয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা নিষ্কলঙ্ক কৌতুক যেমন পরশুরাম’এর ‘হনুমানের স্বপ্ন’ ও কজ্জলী’ বা নবনীতা দেবসেনের ‘সীতা থেকে শুরু’ গ্রন্থের একাধিক গল্পে। কেউবা মূল সাহিত্যের সময়কাল অপরিবর্তনীয় রেখে কাহিনির পরিণতিতে এনেছেন অভিনবত্ব — যেমন বাণী বসু’র ‘রেণুকা’ — সর্বোপরি কোথাও বা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আধুনিককালের জীবনদৃষ্টি, রাজনীতি-সমাজভাবনা ও গভীর মনস্তত্ত্ব — এক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী, মল্লিকা সেনগুপ্ত, জয়া মিত্র উল্লেখযোগ্য নাম। আবার কেউ বা কোনো ঐতিহাসিক — পৌরাণিক বা মহাকাব্যিক পটভূমিকায় সম্পূর্ণ মৌলিক জীবনবাদের কাহিনি রচেছেন। যেমন মহাশ্বেতা দেবীর অনবদ্য সৃষ্টি ‘পঞ্চকন্যা’ অথবা ‘সৌবলী’ (জরৎকারু গল্পগ্রন্থ) গল্প দুটি এবং আরো অনেক। বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি লোকজীবন আশ্রয় করে গড়ে তুলেছেন মৌলিক লোকপুরাণ। বলাবাহুল্য অনেকেই অনুল্লেখিত রইলেন। এভাবেই অনেক সময় স্রষ্টার ভিন্ন মানসিকতা ও রুচির জন্য একই কাহিনি-চরিত্র-ঘটনা ভিন্ন মাত্রা লাভ করে এবং পৃথক তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে।

‘মেঘদূত’ গল্পে লেখিকা দুটি পর্বে বিভক্ত কালিদাসের কাব্যের মূল ‘বিরহভাবনা’ ও ‘মঙ্গালচেতনা’কে অক্ষুন্ন রেখেছেন এবং অতি সংযতভাবে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। আমরা সবাই জানি কালিদাসের

মেঘদূত কাব্যে শৃঙ্গার রসের উদ্ভাবন, রতিপ্রসঙ্গ, যৌনধর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে — বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'তার কাম এমন পরিশীলিত বহুমুখী ও দ্যুতিময়' ছিল। হয়তো বা তার প্রকাশ কালিদাসের প্রতিভায়ই সম্ভব ছিল। লেখিকা অত্যন্ত কৌশলে বিষয়টিকে এখানে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছেন। পরিমিত অবয়বে, রুচিশীলভাবে যক্ষ ও তাঁর বিরহক্লেশকে, রোমান্টিকভাবনাকে পরিবেশন করেছেন।

অপরিবর্তনীয় থেকে গেছে রামগিরি পর্বত, বর্ষব্যাপী প্রবাসকাল যক্ষের প্রবাসবেদনা, অচেতন 'ধূম্রসলিলপুঞ্জ' মেঘমালাকে প্রিয়ার কাছে বার্তা প্রেরণের জন্য দূত করে পাঠানোর পরিকল্পনা! শ্রীমতি মিত্র অতি স্বাভাবিক করে গড়ে তুলেছেন রামগিরি পর্বতের স্থানীয় অধিবাসীজীবন। এই অবসরে ধরা পড়েছে তাঁর সমাজসেবী সত্তাটিও। যক্ষের গতানুগতিক জীবনবর্ণনার পাশাপাশি আমরা অতি পরিশ্রমী, দরিদ্র অতিথিবৎসল, প্রাণোচ্ছল পার্বত্য অঞ্চলের মানুষগুলির জীবনে যেন ঢুকে পড়ি — এ তাঁর সংযোজন। তেমনই কামাতুর যক্ষের কর্মে অবহেলা হেতু নির্বাসনকে তিনি কর্মোপলক্ষে প্রবাসবাসে রূপান্তরিত করেছেন। স্থানীয় বধূ রোহিণীয়াকে এক প্রোষিতভর্তৃকা নারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যার স্বামী দূর প্রবাসে, প্রতিদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা যে গোপনে তার প্রবাসী স্বামীর জন্য অশ্রু বিসর্জন করে এই বিরহকাতর বধূটির অনুষঙ্গেই কুবের মেহতার বিশ্বস্ত কর্মচারী যক্ষের নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী এর কথা মনে পড়ে। দৈনন্দিনতা ও সাংসারিকতার চাপে যে প্রিয়াকে বহুদিন যক্ষের বলা হয়নি — 'আজু রজনীহাম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা! / গিরিধারী সিং রোহিণীয়া প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্কে পাঠকের স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে। গিরিধারী সিং ও যক্ষের কথোপকথনে আমরা জানতে পারি ওই পার্বত্য সমাজে পুরুষদের পেশা মূলত পশুচারণ। এই উপলক্ষে তারা বছরে দীর্ঘ কয়েক মাস গ্রামের বাইরে কাটায় আর প্রতি বছর বর্ষার আগমনে তারা ঘরে ফেরে। প্রায় পুরুষহীন গ্রামের নারীকুলের দায়িত্ব নেন তখন রোহিণীয়ার মতো প্রাজ্ঞ মহিলারা — বধূদের মনোভার থেকে গর্ভভার সবকিছুই তাঁদের স্নেহ-আশ্রয়ে তত্ত্বাবধানে অপশমিত হয়। সেখানকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পোশাক, শারীরিক গড়ন-খাদ্যাভাস এবং ব্যবহৃত কিছু শব্দ (পানিহরিণ, বুঁদবুঁদি, তীজ-তেওহার, কুণ্ডী, মাবেশি) দিয়ে শ্রীমতি মিত্র স্থানিক মানচিত্র ও অধিবাসীদের সম্পর্কে স্বচ্ছ একটি রূপরেখা তৈরি করেছেন, যা, লোকজীবনরসে ভরপুর।

কালিদাসের প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের মতে 'রামগিরি' চিত্র কূটে অবস্থিত — 'যক্ষশ্চক্রে জনক তনয়া-স্নান-পুণ্যোদকেষু / স্নিগ্ধ ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু' সে স্থান কালিদাসের লেখনীতে 'স্নিগ্ধছায়াতরুমণ্ডিত'। পরবর্তীকালে এই অবস্থান নিয়ে মতানৈক্য, বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বাস্তবে এই চিত্র কূটের অবস্থান বুন্দেলখণ্ডে, নর্মদার অনেক উত্তরে — অথচ মেঘদূতে কালিদাস নর্মদা পার হয়ে মেঘকে অলকার অভিমুখে যাত্রা করতে বলেছেন, যা একপ্রকার অসম্ভব। মেঘদূতের প্রথম ইংরেজ অনুবাদক অধ্যাপক উইলসন (সময় ১৮১৬) বলেছেন রামগিরি নাগপুরের উত্তর-পূর্বে রামটেক পর্বত। আরো পরে আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নির্ধারণ করেছেন, মধ্যপ্রদেশে সরগুজা প্রদেশের অন্তর্গত রামগড় পর্বতই হলো মেঘদুত প্রসিদ্ধ রামগিরি। এই মতটিই এখন সর্বজনস্বীকৃত। যার প্রমাণ আমরা পাই সরগুজা পাহাড়ে কালিদাসের অমর কাব্য 'মেঘদূতে'র জন্মস্থান হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠিত কালিদাসের মূর্তি প্রভৃতির মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে লেখিকা একেবারে নির্দিষ্ট করে রামগিরির অবস্থান বলেননি। তিনি ব্যাপক অর্থে ওই অঞ্চলটি ও ওখানকার রুক্ষ-শুষ্ক জলবায়ু, ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। লেখিকা দীর্ঘ কাব্যটির (পূর্বমেঘ এর ৬৪টি ও উত্তরমেঘ এর ৫৪ টি শ্লোক) মাত্র দুটি (২ ও ৭ নং শ্লোক) শ্লোকের খণ্ডাংশ ব্যবহার করে গোটা কাহিনি গড়ে তুলেছেন। অন্তর্বর্তী অংশে তাঁর সংযোজন মৌলিক ও যুগপোযোগী। মূল কাব্যের যে দীর্ঘ পথ বর্ণনা ইত্যাদি আছে আলোচ্য গল্পের ক্ষেত্রে তার কোনো উপযোগিতা নেই। আধুনিক পাঠকের পক্ষেও তা হয়তো ক্লান্তিকর। মাত্র দুটি শ্লোকের আবহে ধরা পড়েছে গোটা মেঘদূতের সৌরভ। সর্বশেষে বলি তিনি যে ভাষায় কাহিনি গড়ে তুলেছেন তা সহজ-সরল-প্রাঞ্জল। বর্ণনার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সাধু রূপ ব্যবহার করেছেন — প্রত্যক্ষ সংলাপে চলিত গদ্য ও যথাসম্ভব দেশজ শব্দের প্রয়োগ করে মাটির গন্ধটুকু এনে দিয়েছেন। চলিত গদ্যে ক্রিয়াপদে সাধু রূপ এক প্রাচীন অনুভব এনে দিয়েছে। সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছে গল্পটি।

‘অধিকন্তু ন দোষায়’

গত এক বছরের বেশি সময় ধরে সমস্ত পৃথিবী তথা মানবসভ্যতা এক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে, যার নাম মহামারী কোভিড-১৯ — দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে ও অসংখ্য মৃত্যুতে আমাদের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত। কিন্তু আমরা হাল ছাড়িনি — তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে। এই সঙ্কটকালেও মানুষের সৃষ্টিশীলতা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ‘ভার্চুয়াল ওয়ার্লড’এ সৃষ্টি হচ্ছে অসংখ্য শিল্প-সাহিত্য। আমাদের অনেকেরই দৈনন্দিন দিনযাপনের অনিবার্য অংশ হয়ে উঠেছে ‘সোশ্যাল মিডিয়া’। এই প্রচেষ্টার এক অনুপম নিদর্শন কবি অরুণাচল দত্ত চৌধুরির লেখা — ‘ভার্চুয়াল মেঘদূত’, এটি ফেসবুকে প্রকাশিত। হয়তো এটিই কালিদাসের মেঘদূতের সাম্প্রতিকতম — নবনির্মাণ, আমি মনে করি ধ্রুপদী ভাবনার পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে এটির উল্লেখ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

পূর্বমেঘ :

১। মন খারাপের পাগল আষাঢ় মাসে / মেঘ হয়ে জমে আকাশের ক্যানভাসে /
ফোন বাজছে না ইমেলেরও দেখা নেই / কেমন আছিস? রয়েছিস সেখানেই’।
মেঘ যদি দেয় বৃষ্টিতে ভেজা চিঠি / ফেরাস না তাকে ভিজে যাস লক্ষীটি।

২। ও মেঘ আষাঢ় মেঘ শোনো / যেতে হবে অন্য মহাদেশে /
যে মেয়েটি কাঁদেনি কখনও / তাকে বোলো ভালো আছি বেশ /
সন্তানেরা আছে দুধে ভাতে / গৃহলক্ষী স্থির অচঞ্চলা /
নিয়মিত সব দিনেরাত / সুখে আছি আগাপাশতলা /
এত সুখে থাকছি যদিও / দিনগুলি উড়েপুড়ে ছাই
ওগো মেঘ তাকে বলে দিও / জিতে গেছে তার ইচ্ছেটাই
ইচ্ছে মানে জ্বলে ওঠা শিখা / ইচ্ছে মানে না লেখা কবিতা
সে কখনও হয়েছে প্রেমিকা / কখনো সে কন্যা, আমি তার পিতা

৩। মেঘ ভুল করিস না দিক / সিঙ্গাপুর হয়ে প্যাসিফিক
পার হয়ে যেতে হবে তোকে / সাথে যাবে বোয়িং বিমান
সাবধান খুব সাবধান / পড়িসনা ঝঞ্ঝাদের চোখে
বহু নীচে প্রবালের দ্বীপ / নীলে ঘেরা মাটির প্রদীপ
জলপরী বাজাচ্ছে বীণা / জানি খুব লোভ হবে তোর
মেখে নিতে আদিম আদর, / কথা দে সেখানে ঝরবি না!

উত্তর মেঘ :

৪। আষাঢ় বাতাসে বিষাদের গুঁড়ো ভাসে / সেই মৃদুগলা ভেসে আসে দূরভাসে
কিছু কিছু কথা আসে ইন্টারনেটে / মনিটরে বোবা শব্দেরা যায় হেঁটে
অ্যাটাচমেন্টে যদি আসে তার ছবি / আমার বেহাগে লেগে যায় ভৈরবী

৫। তোর জন্যই ফিরলো বাঁচার স্বাদ / পত্রবাহক ও মেঘ ধন্যবাদ!

জয়া মিত্র ও অরুণাচল দত্ত চৌধুরী একই শতকের সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে কয়েক প্রজন্মের দূরত্ব অস্বীকার করা যায় না। লেখিকা তাঁর কল্পনায় মেঘদূতকে এই শতক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন, অরুণাচলের কবি ভাবনায় তা অগ্রসর হয়েছে আরো কয়েক প্রজন্ম। শ্রীমতী মিত্র’র রচনায় যক্ষ পঞ্চম শতকের আবহ ছেড়ে আধুনিক কালে পৌঁছে গেছে যখন ‘কনকবলয়ের’ পরিবর্তে হাতে শোভা পায় ‘হাতঘড়ি’। অথবা ‘স্বাধিকারপ্রমত্ততাহেতু’ শাস্তিলাভের পরিবর্তে গল্পের নায়ক ‘ফিল্ম সিটি’ স্থাপনের কাজে প্রবাসী হতে বাধ্য হন। সেখান থেকেই অরুণাচল মেঘদূতকে আরো পরবর্তী সময়ে ক্রমপ্রসারিত করেছেন। তাঁর কবিতায় সনাতন

বাৎসল্য প্রসঙ্গোর সঙ্গোই পাই, ফোন, ইন্টারনেট, মনিটর, সিঙ্গাপুর, প্যাসিফিক প্রভৃতি আধুনিক প্রসঙ্গ ও আধুনিক ভাবনা — 'সন্তানেরা আছে দুধে ভাতে / গৃহলক্ষী স্থির অচঞ্চলা' / বা সে কখনও হয়েছে প্রেমিকা / কখনও সে কন্যা আমি তার পিতা'।

আশার কথা এই, এভাবেই কবি অরুণাচল 'মেঘদূতকে' পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তুলেছেন। এভাবেই কালিদাসের অমর সৃষ্টি 'এক্স প্রজন্ম' (বিশ শতক) থেকে 'ওয়াই প্রজন্ম' (২১ শতক) পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এখানেই এই কাব্যের সার্থকতা তা, কখনো বিস্মৃতির ধুলোয় ঢাকা পড়ে না — যুগ থেকে যুগান্তরে নবকলেবরে পুনর্জন্ম লাভ করে চিরজীবি হয়ে ওঠে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. জয়া মিত্র, 'অকাজের বউ', ১ম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৫
২. অনুবাদক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'মেঘদূত', সন ১৩৪৫
৩. বুদ্ধদেব বসু কৃত 'মেঘদূত' অনুবাদ
৪. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'মেঘদূত', অনুবাদ
৫. জয়দেব বসু, 'মেঘদূত', দীর্ঘ কবিতা
৬. অরুণাচল দত্ত চৌধুরী-ফেসবুক, 'ভার্চুয়াল মেঘদূত'
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেঘদূত' প্রবন্ধ, লিপিকা
৮. ইন্টারনেট সহায়তা

লেখক পরিচিতি: শ্রীমতী মজুমদার, এসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস।